ষষ্ঠ অধ্যায়
কোচবিহারের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি

সংস্কৃতি মানুষের সামগ্রিক কর্মকৃতি ও মানসগত প্রয়াসের ইতিহাস। ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও মানসগত বৈশিষ্ট্য পরম্পরা সূত্রে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবং রূপান্তর ও অর্থবিস্তার ঘটে। কাজেই কোন বিশেষ সময়ের সাহিত্য সংস্কৃতির পর্যালোচনায় লোকসংস্কৃতির প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে।

বাংলার উত্তরাঞ্চলে মানুষের বসতি কবে শুরু হয়েছিল তা গবেষনার বিষয় হলেও একথা ঠিক যে এই অঞ্চলের বন, পাহাড়, নদী এইসব প্রাকৃতিক বিষয়গুলি এই অঞ্চলের জনজীবনকে বারবার নানাভাবে পাল্টে দিয়েছে। জনপদ ও জনজীবন বারবার বীপর্যস্ত হয়েছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন জনজাতির স্রোতে বারবার আছড়ে পড়েছে। এই অঞ্চলের বাঙ্গালীদের দেহ বৈশিষ্ট্যর মধ্যে, বিভিন্ন জনজাতির দৈহিক বৈশিষ্ট্যর মধ্যে বিচিত্র সমন্বয়ের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে। বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন কোচ, মেচ প্রভৃতি উপজাতি খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতকে উত্তর বঙ্গে এসে বাস শুরু করে। এরা বৃহত্তর বোড়ো জাতির শাখা প্রশাখা। কোচবিহারের জনজাতির একটা বড় অংশই হচ্ছেন রাজবংশী সমাজের মানুষ। এছাড়া রয়েছেন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু গন, তৎসহ কিছু উপজাতি। সেদিন পর্যন্তও এই অঞ্চলের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গের বঙ্গের যে যোগাযোগ ছিল সীমিত। এখনও এই জেলার গ্রামীন জীবন এখানে ততটা বিচলিত নয়।

এই পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য লালিত হচ্ছে লোকসমাজের মধ্যে। পরিবর্তনের ছোঁয়া যে লাগেনি তা নয়। কিন্তু তৎসত্বেও কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি অতীতের মায়ামৃগ নয়। এখানকার লোকগীতি,লোকনাটক, ব্রত-পাচালি,প্রবাদ প্রবচন (ছিলকা) স্বমহিমায় এখনো বিরাজিত। এখানে আমরা লোকসংস্কৃতির যে ধারাগুলো এখনো লক্ষণীয়ভাবে প্রবহমান তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি। এই লোকসংস্কৃতির চর্চা সামগ্রিকতার স্বার্থেই বরনীয়।

প্রথমেই কোচবিহারের লোকগীতির প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। কোচবিহারের লোকগীতির প্রসঙ্গে ভাওয়াইয়া, চটকা, জাগের গান, ময়নামতীর গান, মদনকামের গান, হেটো কবিতা ইত্যাদি নাম স্বাভাবিকভাবেই উচ্চারিত হয়।

উল্লেখিত লোকগীতি গুলির ভাওয়াইয়া গান সর্বাগ্রে আলোচনার দাবী রাখে। কোচবিহারের এই বিশেষ লোকসংগীতের ভাওয়াইয়া নামকরন প্রসঙ্গে নানামুনি নানামত পোষণ করেন। যেমন -

(ক) ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যে, সুরেন্দ্রনাথ বসুনীয়া, যতীন্দ্র দেসরকার প্রমুখের মত অনুযায়ী ভাব ইয়া ভাওয়াইয়া অর্থাৎ এই গানগুলি ভাবমূলক গান।

(খ) শিবেন্দ্রনারায়ন মন্ডল পূর্বোক্ত মত সমর্থন করেও ভাওয়াইয়া গানকে উদাস করাগান বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন।

(গ) চিত্তরঞ্জন দেবের মতে এই গুলি বাউদিয়া সম্প্রদায়ের রচিত বলে ভাওয়াইয়া নাম।

(ঘ) কারও কারও মতে মইষালের গানের সুর 'বাও' বা বাতাসের মধ্যে দিয়ে আসে বলে 'ভাওয়াইয়া' নামকরনের উৎপত্তি হয়েছে।(১)

(ঙ) কারও কার মতে 'ভাও' শব্দের অর্থদরদাম। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মনের ঠিকানা, প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছার খোঁজ নেওয়াও এক ধরনের দরদাম করা। তাই এই গানের নাম ভাওয়াইয়া।

(চ) ভাওয়াইয়ার আর এক অর্থ মইষালের চারণ ক্ষেত। সেখানে মইষালরা মোষ চড়াতে চড়াতে গান গায়। তাই এই গানের নাম 'ভাওয়াইয়া'।(২)

তবে সমালোচক দিগ্বিজয় দে সরকারের মতে ভাওয়াইয়া হল রাখালিয়া সংগীত। 'ভাওয়া' শব্দের অর্থ হল নদী তীরবর্তী তৃনভূমি। আত্মীয় স্বজন থেকে লোকালয় থেকে বহুদূরে যৎসামান্য বেতনে ঐ তৃনভূমি তথা কৃষিক্ষেত্রে যে মইষালরা কাজ করতেন তাদের কথাই ভাওয়াইয়ায় স্থান পেয়েছে। যেমন —

"ওরে ভইষ চড়ান মোর মইষাল বন্ধুরে
ঐনা চড়ের মাঝে
ওরে নলবাড়ী খাগড়ার ভাঙ্গে বুকের ছাল
যাবে মইষালরে।"

(কথা ও সুর - প্রচলিত। গীত - নায়েব আলী।
পূ - ৮১ নন্দন, ডিসেম্বর -১৯৯৩।)

ভাওয়াইয়া গান প্রসঙ্গে উত্তরবাংলার পল্লীগীতির সংকলক হরিশচন্দ্র পাল তাঁর 'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি (ভাওয়াইয়া খন্ড) গ্রন্থের নিবেদন পর্বে 'থ' পৃষ্ঠায় একটি প্রাচীন ছড়া উল্লেখ করেছেন । —

'সারিন্দা বাজায় সাউদ সওদাগর
বাঁশি বাজায় চোর
ব্যানা বাজায় ত্যানা পিন্দা
দোতরা হারামখোর ।'

উপরের ছড়া থেকে এটা প্রমানিত এই গান সৃষ্টিহয়েছে চারণ ক্ষেত্র -কৃষি ক্ষেত্র ভাওয়া থেকে ,লোকালয়ে নয় । এই গানগুলি মূলত শ্রমসংগীত । তবে এই গানের উৎস সর্ম্পকে শ্রী গঙ্গাধর দাস ও প্যারীমোহন দাসের মতামত উল্লেখ করে গবেষক ফনী পাল লিখেছেন যে চন্ডীমঙ্গল, মনসমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল কাব্য ও বিভিন্ন প্রকার 'পালাটিয়া গান' থেকে ভাওয়াইয়া গানের উৎপত্তি ।

ভাওয়াইয়া গানের ভাবের ও বিষয়বস্তুর ভিন্নতাঅনুসারে আরোপিত সুরগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলি হল চিতান ভাওয়াইয়া, ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া, করুন সুরের ভাওয়াইয়া, যে গানে ব্যাথাতুরা নারীর হৃদয় বেদনা ধরা পড়ে, মইষালী চাল বা সোয়ারী চাল, দীঘল নাসা ভাওয়াইয়া ।

এছাড়াও রয়েছে ভাওয়াইয়া গানের চটুল রূপ চটকা যা আবেগ, সূর ও তাল বিচারে লাস্যময়ী । তবে চটকা গানে ও কখনো কখনো জীবনের গভীর কথা ফুটে ওঠে ।

ভাওয়াইয়া গানের বিভিন্ন সুরের যে পরিচয় আমরা পাই তা এইরকমের —

ক) চিতান ভাওয়াইয়া ঃ বিচ্ছেদ বেদনার এই গানটি পরকীয়া প্রেমের মাধূর্যময় এবং এই গান অস্থায়ীতে উচ্চগ্রাম থেকে নিম্ন গ্রামে নামে । যেমন — '(আজি) নদী না যাইওরে বৈদ (১)
নদী না যাইওরে (বৈদ) নদীর খেলারে ঘোলা পানি ।'

(বৈদ বেঁটে (কিশোর চ্যাংড়া) — পৃ— ১ — উত্তরবাংলার পল্লীগীতি (ভাওয়াইয়া খন্ড) ।
হরিশচন্দ্র পাল ।

অথবা

'পবন — আমি নারী ভাসিলাম গঙ্গার জলে
পবন রে ।।
আর জলে যেমন ফ্যানা ভাসে
ও হো হো পবন জলের ফেনা জলে মেশে
পবন রে ।।'
(কথা ও সুর প্রচলিত)

খ) ক্ষিরোল ভাওয়াইয়া ঃ ' ক্ষিরোল ডাং ' এ পরকীয়া প্রেম অথবা পতিপ্রেম উভয়ই প্রকাশিত হয় । এই সুর নিম্ন গ্রাম থেকে উচ্চ গ্রামে আরোহন করে । যেমন — '

'' এপারে আমার বাড়ী ওপারে বন্ধুর বাড়ী
মধ্যে হইল ক্ষীরল নদীর খেওয়া ।
ওরে কাজল ভ্রমরা গরুর রাখোয়াল রে
মুই নারী কোলে বাচ্চা ছাওয়া ।। ''
(কথা ও সুর - প্রচলিত)

অথবা —

'' তোরষা নদীর উতাল পাতাল কার বা চলে নাও ।
নারীর মন মোর উতাল পাতাল কার বা চলে নাও ।''
(কথা ও সুর প্রচলিত)

গ) করুন সুরের ভাওয়াইয়া ঃ সাধারনত এই সব গানে করুণ রসের প্রাধান্য থাকে । যেমন —

"আরে ও সোনার নাইয়া
ভাবের বন্ধু মোর গেইচে ছাড়িয়ারে
যদি বন্ধুর নাগাল পাও
ছাড়িয়া না দিম আর রে
আরে ও কাজেলা নাইয়া
নিদানে কর পার ।
ও কি দেওয়ায় করিছে অন্ধকার ।।"
(কথা ও সুর প্রচলিত)

ঘ) নারীর বিরহাত্মক ঃ এই ধরনের গানে নারীহৃদয়ের বিরহব্যাথা তীব্রভাবে ধরা পরে ।
যেমন —

'কালা ভুলিয়া রইতে পারিনারে
কালা ভুলিয়া যাইতে পারিনারে
ও হো রে প্রানের কালারে ।।'
(কথা ও সুর প্রচলিত)

ঙ) মইষালী চাল বা সোয়ারী চাল ঃ মইষালদের গাওয়া বিশেষ চঙ্গের গানকে মইষালী বা সোয়ারী চাল বলে । এই সুরে চলমান মহিষের দুলকিতাল ধরা পরে । যেমন —

'বাতির শিখা বাতির শিখা জ্বালেয়া দিলকে
দিবানিশি মনের আগুন জ্বলিজ্বলি উঠেরে সখি
এ মনের আগুন ।'
(কথা ও সুর প্রচলিত)

চ) দীঘলনাসা ঃ এই গানে দীর্ঘস্থায়ী প্লুতস্বরে মৃদু মর্মস্পর্শী তাল লক্ষনীয় । এই সুরে দীর্ঘশ্বাসের প্রয়োজন হয় ।

যেমন —

'কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে
কোন দিন আসিবেন বন্ধু
কয়া যাও কয়া যাওরে ।।
যদি বন্ধু যাবারে চাও
ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাওরে ।।
বট বৃক্ষের ছায়া যেমন রে
মোর বন্ধুর মায়া তেমন রে ।।'
(কথা ও সুর প্রচলিত)

এছাড়াও সূক্ষ বিচারে ভাওয়াইয়ার আরও কিছু উপবিভাগ করা যায় । যেমন —

ভাওয়াইয়া গোষ্ঠ লীলা ঃ

'ও মা জননী বিদায় দ্যাও মা যাব বৈদ্যাশে
নেওমা তোমার সিঙ্গা বেনু
বিদাও দ্যাও মা রাম কানু মা
জনমে জনমে না হইব দেখা ।'

(কথা ও সুর প্রচলিত)

ভাওয়াইয়া লাচারি (নিমাই সন্ন্যাস পালার গান) ঃ

'হায় গো আমার মনে কয়রে
আমার মনে কয় চিতে কয় মিছাঘর বাড়ীরে
যৈরশী না হইল মনরে —'

(কথা ও সুর প্রচলিত)

ছ) চটকা গান ঃ চটকা গানকে ভাওয়াইয়া গানের চটুল রূপ বলা যায় যা আবেগ সুর ও তালবিচারে লাস্যময়ী। তবে চটকা গানেও কখনো কখনো গভীর ভাব থাকেনা এমন নয় । প্রচলিত ভাওয়াইয়ার সাথে চটকার পার্থক্য হল ভাওয়াইয়া চার আট মাত্রার তালে ও চটকা তিন তিন ছয় মাত্রার চালে গাওয়া হয় । উদাহরণ হিসাবে এখানে একটি চটকা গান উদৃত করা হল ।

আরে দাড়ি পাল্লা ঘাড়ে করি পাইকার বেড়ায় টারিটারি
কোন বাড়িতে কোষ্টা বেচাইবে ।
এক বুড়ার হৈলসাত বেটা সেই বাড়িতে বেচায় পাট
ছোট ব্যাটা তার মাগী আইনাছে ।
ঐ মাগীটার বড়ধার ধাক্কে ফ্যালে মাইল্লেক বড়
ত্যাল বাটিটা মাটিতে ফেলাইছে ।
উঠ ছেরি কর কাম ক্ষুধায় আমার যায় পরান
শাড়ী কিনিব রাসের মেলাতে ।

(চটকা — কেচ্ছা - আংশিক)

(কথা ও সুর — কেশব বর্মন ।)

আর একটা কথা এই প্রসঙ্গে আলোচনা যোগ্য । দোতারা বাদদিয়ে ভাওয়াইয়া গানের কথা কল্পনায় ও আনা যায়না । ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ইরান দেশে প্রচলিত দোতার ও বাংলার দোতারা প্রায় অভিন্ন । বলা প্রয়োজন ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমনের পরই এদেশে সানাই ও দোতারা যন্ত্রের আগমন হয় । ভাওয়াইয়া গানের অনেক স্বনামধন্য গায়ক, সুরকার ও প্রচারক মুসলীমসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় এই বক্তব্যর সারবত্তা প্রমানিত হয় ।

বস্তুত ভাওয়াইয়া গান শুধু কোচবিহারের একথা বলা অসঙ্গত । কোচবিহারের নদী, উন্মুক্ত প্রান্তরের সাথে এর সম্পর্ক অচ্ছেদ্য, কিন্তু এই গান কোচবিহারের সীমারেখা ছাড়িয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলার উত্তরাঞ্চলের বহুসংখ্যক মানুষের প্রানের গান বলা যায় । উপমহাদেশের প্রখ্যাত লোকসঙ্গিত গায়ক আব্বাসউদ্দিন আহমেদের প্রধান পরিচিতি তিনি ভাওয়াইয়ার গায়ক । ভাওয়াইয়া সংগীত তাকে যেমন বিশ্বদরবারে স্বিকৃতির বিজয়মালা পরিয়েছে তেমনি ভাওয়াইয়ার কথা ও সুরকে বিশ্বের দরবারে তিনি পৌছেদিয়েছেন বলা যায় । এছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ বসুনিয়া, নায়েব আলী, চিন্তাহরন রায়, গঙ্গাচরন বিশ্বাস, প্যারিমোহন দাস, শ্রীমতী প্রতিমা বড়ুয়া (পান্ডে) এবং নামী ও অনামী বহু ব্যক্তিত্ব ভাওয়াইয়ার অনুশীলনে রত ছিলেন এবং আছেন বলা যায় ।

জ) জাগের গান ঃ কোচবিহার সহ উত্তর বাংলার লোক সংস্কৃতির এক বিরাট ঐতিহ্য হল বাঁশ পূজা বা মদনকাম পূজা যা এখানকার রাজবংশী জনসমাজেই বহুল প্রচলিত । চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী বা মদন চতুর্দ্দশীতে এই অনুষ্ঠান শুরু হয় । দুটি দীর্ঘ বাঁশ উঠানে তুলসি মঞ্চের পাশে বহির্ব্বাটিতে পোঁতা হয় । বাঁশে কাপড় জড়িয়ে চাল ঝুলিয়ে দেওয়া হয় । দুধ মিশ্রিত চালের গুড়ো ভাঙ সহযোগে মদন দেবকে পূজা করা হয় । বাঁশ এখানে মদন দেবের

প্রতীক। এই পূজাকে ঘিরে কয়েকটি খন্ডগীত ও অনুষ্ঠান আছে। এগুলি হল —

ক) বাঁশ কাটা ঃ এই পর্বে গীদাল বাঁশের জন্ম খন্ড গান করে একটি নির্বাচিত বাঁশ কাটেন ও আগুনে গরম করে সোজা করেন।

খ) বাঁশের গাওধোয়া ঃ এই পর্বে শুদ্ধিকরনের জন্য নির্বাচিত বাঁশটিকে স্নান করানো হয়।

গ) কাপড় সৃজন ঃ এই পর্বেকাপড়ের জন্ম কাহিনী গান করে বাঁশটিকে দীর্ঘ ৬০ হাত কাপড়ে জড়ান হয়।

ঘ) চামর সৃজন ঃ বাঁশ পূজায় বাঁশের অঙ্গসজ্জার অবিচ্ছেদ্য অংশ চামড়ের জন্ম গান করা হয়।

ঙ) ভাঙ সৃজন ঃ এই পর্বে বাঁশ পূজার মূল উপকরন ভাঙের সৃষ্টির প্রতিক্রিয়া বর্নিত হয়।

চ) নাড়ু সোজা ঃ এই পর্বে ভাঙের নাড়ু পূজার প্রধান আকর্ষন হয়ে ওঠে।

শেষ পূজার দিনে গ্রামের বাইরে খোলা মাঠে রতি ও মদনের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি, যৌন আবেদনের ভঙ্গিমা গান সহযোগে প্রদর্শিত হয়। এইভাবে কামচেতনা জাগিয়ে তোলা হয় বলে একে জাগের গান বলে। মেয়েদের এই গানের আসরে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এই গানগুলি 'কানাই ধামালী বা লীলাজাগ' এবং 'মোটাজাগ' এই দুই ভাগে বিভক্ত। উৎসবটি বয়স্ক হিন্দু পুরুষদের। এতে 'হায় আল্লা' পদ আছে যা সাম্প্রদায়িক মিলনের বার্তা বহন করে। এইখানে বাঁশ কাটা বা মদনকাম গানের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা যায়।

যেমন — ' সাতালি পর্ব্বতে আছে কপালী হেন গাই।
মায়াকরি নামাইল তাক মদনকাম গোসাঞি ।।'
— উত্তরবঙ্গের জাগ গান — কমলেশ সরকার)

অথবা — 'হে রাম ভাটি হাতে আইল কুচুনী, হাতে পিতলের খারু ।
তায় সে বানাইতে পারে মদনকামের নারু ।।'
(পৃ - ৭ - নারুসোজা - উত্তরবঙ্গের জাগের গান - কমলেশ সরকার)

ময়নামতীর গান ঃ কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের আর একটি জনপ্রিয় গান হল 'ময়নামতীর গান'। 'গোপী চন্দ্র বা ময়নামতীর' গানের ঘটনাস্থল অধুনা বাংলাদেশের রঙপুর জেলা হলেও কোচবিহার অঞ্চলেও এই গান কম জনপ্রিয় নয়। কাহিনীটি সংক্ষেপে এই রূপ - বিলাসী রাজা মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র গোপীচন্দ্র মা ময়নামতীব অভিভাবকত্বে রাজা হন এবং বয়ঃ প্রাপ্ত হয়ে অদুনা ও পদুনা নামে দুই যুবতীকে বিয়ে করেন। কিন্তু বিয়ের কিছুদিন পর গোপীচন্দ্রের মঙ্গলার্থে তার মা তাকে বারো বছরের জন্য সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেন। বারো বৎসর সন্ন্যাস জীবন যাপনান্তে গোপীচন্দ্র আবার সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। এই কাব্যে গোপীচন্দ্রের পত্নী প্রেম ময়নামতীর মাতৃস্নেহ ইত্যাদি সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

যেমন ময়নামতীর উক্তি — 'সন্ন্যাস হও সোনার জাদু ভালাই চিন্তিয়া,
নৈলে যেনে তোর সোনার তনু না ফেলাও টানিয়া।
কলিকাল মন্দ কাল কলির সাত ভাও।
জুয়ান বেটা না পোষে বৃদ্ধ বাপ মাও।'
(পৃ - ১৫ - গোপীচন্দ্রের গান, বুঝান খন্ড — হেমন্ত কুমার রায় বর্মা)

অথবা গোপীচন্দ্রের কথা — ' যখন আছিলাম মা রাজ্যের ঈশ্বর
স্বর্ণর থালত অন্ন খাইনু বিস্তর ।।
এখন হইনু কড়াকড় ভিখারী
স্বর্ণর থালত অন্ন খাইতে না পারি ।।'
(পৃ - ৯৯ - উত্তরবঙ্গের ময়নামতীর গান — উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি — সুশীল কুমার ভট্ট্যাচার্য)

ইত্যাদি পদগুলিতে আঞ্চলিক ভাষা বৈশিষ্ঠসহ সেই সময় ধরাদিয়েছে।

হেটো কবিতা ঃ যেকোন অঞ্চলের নির্ধারিত সময়ের ব্যাবধানে বসা হাট সেই অঞ্চলের প্রানস্পন্দনের প্রতীক বলাযায়। এখানে ব্যাবসায়ীদের আনিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের প্রয়োজনে অনেক সময় কাব্যিক ঢং আশ্রয় করা হয়। সবসময় নাহলেও অনেক ক্ষেত্রে এই হেটো কবিতা সমাজ ও সাহিত্যর স্বরূপ উপলব্ধিতে অনেকটাই সহায়তা করে। কোচবিহারের হেটো কবিতা গুলির ক্ষেত্রেও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। কোন রাজরোষ, অর্থলোভ, সমালোচকের নিন্দাবাদ এদের বিচলিত করতে পারেনা। বরং গ্রামীন জীবনের তুচ্ছ সমস্যা থেকে বৃহত্তর সমাজ জীবনের সমস্যা বা ঘটনা সমূহ এদের কবিতায় মূর্ত হয়ে ওঠে। এই ধরনের কবিদের অনেক সময় 'বাওরা কবি' বলাহয়। বাইশকান্দা গ্রামের জুরান চন্দ্র সাহা কোনও নারীর রূপকে তার কবিতরয় ফটিয়ে তুলেছেন এই ভাবে —

'পায়ে আলতা পরা ২ যায়না চাওয়া চটি জুতা পায়,
হেলিয়া দুলিয়া পরে যৌবন জ্বালায়।।'

(পৃ – ২২– লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গ — দিগ্বিজয় দেসরকার।)

কোচবিহারের খাপাইডাঙ্গার যতীন্দ্র নাথ সরকারের কবিতা -

'তোর লজ্জানাই ২ ধর্ম নাই ইহা মোদের জানা
নিরস্ত্র বাঙালীর বুকে দিচ্ছ তুমি হানা ।' য়

(পৃ - ২৫ - লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গ - দিগ্বিজয় দে সরকার।)

বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষের উপর পাক জঙ্গিশাহির অত্যাচার গভীর ভাবে বিবৃত হয়েছে।

তবে কোচবিহারের লোক কবিদের মধ্যে নিবারণ পন্ডিতের নাম বিভিন্ন কারনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ যোগ্য। তার হেটো কবিতাকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের বিরূদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ারে পরিনত করেছেন। তার জাপানী আগ্রাসন বিরোধী 'জনযুদ্ধের ছড়া' বিক্রি হয়েছিল ৮০ হাজার কপি ।

লোকনাটক ঃ কোচবিহারের লোকনাটক জনমন রঞ্জিনী প্রবাহে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকারকরে আছে। এই নাটকগুলি দুটি পালায় বিভক্ত, কুশান ও দোতারা। প্রারম্ভিক পর্য্যায়ে কুশান বলতে রামায়ন ও মহাভারতের কাহিনীর পালাগুলি বোঝাতো। বর্তমানে কুশান পালায় লবকুশ, দানীরাজা হরিশচন্দ্র, বেহুলা ভাসানী বা বিষহরি পালা এবং দোতারা পালায় দুবলাবালী, বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী, রূপধন কন্যা ইত্যাদি পালা গাওয়া হয়।

কুশান পালায় মূল গায়কের সাথে চারপাঁচজন ছেলে মেয়ে সেজে নাচে ও গায়। সঙ্গে বেহালা, খোল, করতাল, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থাকে। আগে কুশান গানে মেয়েরা অংশগ্রহন না করলেও বর্তমানে তিন দশক ধরে মেয়েরা অভিনয়ে এগিয়ে আসছে ।

কুশান পালার মূলদের মধ্যে রয়েছেন ঃ কালীদাস বর্মন, ধরনী বর্মন, রজনী বর্মন, পবন মোদক, ললিত বর্মন, লক্ষেশ্বর অধিকারী ইত্যাদি ।

এই লোক নাটক গুলির কোন লিখিত রূপ নেই। এদের প্রয়োগ পদ্ধতি পাঁচ প্রকার ঃ আসর-বৈশিষ্ঠ, আলোর বৈশিষ্ঠ্য, সঙ্গীত, নৃত্য এবং অভিনয় কলা ।

কুশান পালা মূলের গলায় নামাবলী এবং অন্যত্র উত্তরীয় থাকত, তবে বর্তমানে যাত্রার অনুকরনে পোষাকে বর্ণময়তা এসেছে। কুশান পালায় প্রদর্শিত আর একটি বিষয় হল লোক সাংবাদিকতা যার মাধ্যমে উঠে আসে প্রচলিত কোন সমস্যা। যেমন লেংরার কথা 'আলাপে সালাপে মুই কনু আমার ইত্তি খেসারী
মুসুরী কোন ডাইল গলেনা। ভাত করে কারাং কারাং।
কনটোলের জিনিস তো।' (পৃ - সতী বেহুলা)

সংলাপের ভাষার ছাঁদ স্থানীয় উপভাষা হলেও কখনো কখনো শিষ্ঠ ভাষা ব্যবহারের ঝোঁক লক্ষ করা যায়। যেমন — চন্দ্রার কথা 'রাজকুমার, দেবরাজ যখন আমাকে অভিশাপ দিল আমি দেবরাজের পায়ে পরিয়া ক্ষমা চাইলাম।' (পৃ — ২১ — বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী)

আবার গনশিক্ষা প্রসারে এই লোকনাটক গুলি কখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যেমন — বিশ্বকেতুর কথা

"পৃথিবীর অধিক গুরু হয়েন জননী,
গগন হইতে উচ্চ পিতা বলি মানি।"

(পৃ — ৩৪ — বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী)— কোচবিহারের লোকনাটক — দিগ্বিজয় দেসরকার।

কখনো কখনো দেখা যায় এই লোকনাটকগুলিতে প্রবাদ প্রবচনের ব্যাপক প্রয়োগ।
যেমন — হাদাং এর উক্তি–

"ঐ যে কয় না —আদা খায় যায় ঝাল বুঝবে তায়।"

(পৃ - ৭০ - দুবুলাবলী - কোচবিহারের লোক নাটক - দিগ্বিজয় দেসরকার।)

এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন বিষহরি পালা কুশান গানের অর্ন্তভুক্ত হলেও এর বৈশিষ্ঠ হল এই গানে স্থানীয় কুপা বাঁশ অবশ্য প্রযোজনীয়।

এখানে কয়েকটি দোতরা পালার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল যার সাহায্যে বিন্দুতে সিন্ধুর প্রতিফলনের মতই কোচবিহারের লোক নাটকের কিছু আভাষ পাওয়া যেতে পারে। যেমন —

'বিশ্ব ঃ ধাই মা, মুই বাড়ি গেইলে যদি চন্দ্রাবলী চলি যায়।

ভারতী ঃ তা কি হয় বাবা। ওয়ার বাহাত্তুর নারী আছে মোর হাতত। শাড়ি না পাইলে উয়ায় স্বর্গে যাবে কেমনে। ঐ শাড়ি মুই রাবণের মৃত্যু বাণের চাইতেও গোপনে রাখিছুং।'

(পৃ - ২৯ - বিশ্বকেতু চন্দ্রাবলী - কোচবিহারের লোকনাটক - দিগ্বিজয় দেসরকার।)

অথবা —

'যমুনা ঃ তোমরা কার ? ভরদুপুরে গরমে জলের ঘাটে গান করেন ?

শ্যাম ঃ কেনে পরপুরুষের গান শুনিয়া তোর গান গাওয়াটা দোষ নয়কি ?'

(পৃ - ৬৮ - দুবুলাবলী - কোচবিহারের লোক নাটক - দিগ্বিজয় দে সরকার।)

কুশান লোক নাটকের আলোচনার পর স্বাভাবিক ভাবেই আসে দোতরা গানের প্রসঙ্গ। কুশানের মত দোতরা গানেরও কোন লিখিত রূপ নেই, তবে কুশান যেমন ধর্মীয় পালা, দোতরা আবার ধর্মনিরপেক্ষ পালা। এখানে বলা প্রয়োজন দোতরা বাদ্যযন্ত্রটি মুসলীম সংস্কৃতির সাথে যুক্ত। আধুনিকতার স্পর্শ বর্জিত এই পালা গান কোচবিহরের প্রাচীন ঐতিহ্যর ধারক ও বাহক বলা যায়। দোতরা গায়কদের মধ্যে যাদের নাম সর্বাগ্রে স্মরনে আসে তারা হলেন ডোমা মুচী, ধনবর দাস, ফারাস মিঞা, বাঁটু দাস, হোকা রায়, মেঘনাদ রায়, সুনীল রায় ইত্যাদি।

<u>ব্রত পাচালী</u> ঃ যুগ যুগ ধরে প্রচলিত নারী সমাজের ব্রত পাঁচালী গুলি সমাজের হৃদস্পন্দন বলে গন্য। নারী চিরকাল যে শান্তগৃহকোন তৈরী করে তার মাঝে এই ব্রত পাঁচালী গুলিতেই তার পরিবার কেন্দ্রীক আকাঙ্খাগুলি ব্যক্ত হয়। কোচবিহারের ব্রত পাঁচালী গুলি এর ব্যাতিক্রম নয়। এখানে কোচবিহারের ব্রত কথাগুলির এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে।

ক) কাত্যায়নী ব্রত ঃ সর্বগুন সম্পন্ন স্বামী লাভের আকাঙ্খায় কোচবিহারের মেয়েরা সাত বৎসর বয়সথেকে এই ব্রতানুষ্ঠান করত। কার্তিক মাসের রাস পূণিমায় এই ব্রতানুষ্ঠান শুরু হত। বর্তমানে এই ব্রতানুষ্ঠান কমে এসেছে বলাযায়। এই পূজা ব্রতের গান হল —

'আজি বত্তি পানি তোলে শুক লাগি
এবও করিলে কি কি পাই
জন্ম আয় তে দিন কাটাই।'

(পৃ - ১৮ - কোচবিহারের ব্রত কথা - হিমাদ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য)

খ) সাট পূজা ব্রত ঃ পৃথিবী শষ্য শালিনী ও গৃহিনী আলৌকিক শক্তির অধিকারিনী হবার কামনায় হর-গৌরী ও লক্ষী-বাসুদেবের উদ্দেশ্যে কুমারী মেয়েরা এই ব্রত করতেন।

গ) নিষ্কলঙ্ক পূজা ব্রত ঃ মেয়েদের জীবন যাতে নিষ্কলঙ্ক হয় সে জন্য পৌষ মাসের অমাবস্যায় এই ব্রত পালন করা হয়।

ঘ) সুবচনী পূজা ব্রত ঃ বাড়িতে নববধূর আগমন ঘটলে ও কোন মনোবাঞ্ছা পূরনের জন্য বছরের যেকোন সময়ই সুবচনী পূজা করা হয়।

ঙ) দেউল পূজা ব্রত ঃ স্বামী পুত্র সহ সুখ কামনায় সধবা নারীরা সমগ্র মাসে এই ব্রত করেন।

চ) বাটেশ্বর পূজা ব্রত ঃ সম্ভাব্য সংসার জীবনে স্বামী পুত্র সহ সুখ শান্তি লাভের জন্য কুমারী মেয়েরা সমগ্র মাঘ মাসে এই ব্রত করে ।

ছ) একূল ওকূল পূজা ব্রত ঃ কুমারী মেয়েরা পূর্ব জীবনের স্বামীকে এই জীবনে ও আগামী জীবনে স্বামী হিসারে কামনা করে সমগ্র বৈশাখ মাসব্যাপি এই ব্রতানুষ্ঠান করে । তবে বাটেশ্বরা পূজা ও একুল ওকুল পূজাব্রত এখন কোচবিহারে ক্রমশ অপ্রিয় হয়ে আসছে ।

জ) সাইটল পূজা ঃ সবচেয়ে দীর্ঘ ব্রত কথা যুক্ত পূজার কাহিনীতে দেবদেবীর আবাহন, ঘটসৃজন, সিন্দুর,ধূপসৃজন, স্বর্গথেকে দেবগনের আগমন, ফুল ও সবজি সৃষ্টি, সাইটলের জন্মলাভ, আয়রন সাধুর বেটা মনিহার আর রাগর বেটি লীলাবতীর মূল কাহিনীর উপখ্যান রয়েছে । এই কাহিনীতে লীলার খোপা বাঁধার বর্ণনা —

‘ তার পাছে বান্দে খোঁপা নাম উনি ঝুনি
তার তলত, ভাসা বান্ধে বাঙা বাড়িয়া টুনি
তার পাছে বান্ধে খোঁপা খোঁপার নাম মরূয়া
(পৃ - ৩৪ - উত্তরবাংলার লৌকিক ব্রতকথা - হরিশ চন্দ্র পাল ।)

উল্লেখযোগ্য । তাছাড়া ব্রতকরহিনীর ৩৭ নং পৃষ্ঠায় সপ্তভিভার নাম যেমন ধুমা, ম্যানা, সাইয়া, হুয়া, গোড়া, পাগল, হ্যাটেং , ট্যাং এর নামের উল্লেখ দৃষ্টি আকর্ষন করে ।

ধরম ঠাকুর (ধর্ম ঠাকুর) ব্রত কথা ঃ

কোচবিহার তথা উত্তরবাংলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে স্বেচ্ছা সৃষ্ট আদিপুরুষ ধরম ঠাকুর বা ধর্মের পূজাকরা হয় । ধর্ম ঠাকুরের ব্রতকথার গান হল- “ সিংহ রাজার ঘরে নবলক্ষ ধন তারে
ধনেশ্বর সারথী নাই এক জনা ।”
(পৃ - ৭৮ - উত্তর বাংলার লৌকিক ব্রতকথা - হরিশ চন্দ্র পাল ।)

হুদুম দ্যাও পূজা ঃ

কোচবিহার চিরদিনই অতিবৃষ্টির অঞ্চল হলেও কখনো কখনো মৌসুমী বায়ুর বিলম্বিত আগমনে বা খামখেয়ালীপনায় অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা দেখাদিত । তাই ফসলের অজন্মা দেখাদেবার ভয়ে এখানে অনুষ্ঠিত হত ‘ হুদুম দাও’ পূজা । কৃষি নির্ভর এই পূজায় অংশ গ্রহনের অধিকার শুধুমাত্র নারীদের । নদীর পারে বা নির্জন স্থানে অনুষ্ঠিত এই পূজাপ্রঙ্গনে পুরুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ । এই পূজার গানেই বৃষ্টির জন্য কৃষকের চিরদিনের কামনা ধ্বনিত হয় । যেমন ‘হুদুম দ্যাও হুদুম দ্যাও
এক চৌল পানি দেও মাথাটা মুই ঘসোঙ
এক চৌল পানিদেও বুকটা মুই ঘসোঙ । ’
(পৃ - ১০৫ - উত্তর বাংলার লৌকিক ব্রতকথা - হরিশ চন্দ্র পাল ।)

কার্ত্তি পূজা (কার্ত্তিক পূজার ব্রতকথা) ঃ সাধারনত নারীরা পুত্র কামনায় কার্ত্তিক মাসের শেষে ব্রত কথা পাঠ সহ এই পূজা করে । যেমন — ‘বাম হস্তে ধর্নুবান ডাইন হস্তে মৈয়ররে
যাও কাত্তিমোর গোদাদেও সাগরে ।’
(পৃ - ১০৫ - উত্তরবাংলার লৌকিক ব্রতকথা – হরিশ চন্দ্র পাল ।)

এর মাধ্যমে পূজা অনুষ্ঠিত হয় । তবে মানত করা থাকলে কার্তিক মাস ছাড়াও এই পূজা হয়ে থাকে । মোটামোটি ভাবে এই হল কোচবিহারের মেয়েলী ব্রত কথার পরিচয়

<u>প্রবাদ প্রবচন (ছিলকা)</u> ঃ

প্রতিটি স্থানেই মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধির মাধ্যমে কিছু কিছু প্রবাদ প্রবচন গড়ে ওঠে যা পরবর্তী প্রজন্মের ভাবনাকে সমৃদ্ধতর করে বলাযায় । কোচবিহারের প্রবাদ প্রবচন, যা শ্লোক থেকে উদ্ভূত শব্দের অপভ্রংশ রূপ ‘ছিলকা’ বলে পরিচিত সেই গুলি সম্পর্কে ও এই মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য । যেমন কোন নারীর উক্তি — ‘রাজার হাতি বন্দীহইছে
দোতায় আর দড়ি
মুই নারী বন্দী হছুং
বন্দী তোর মায়ায় পড়ি।’

(পৃ - ১৭ - রাজবংশী ভাষায় ছিলকা -মথুরেশ চক্রবর্তী - সাপ্তাহিক ত্রিবৃত্ত,১৫ই কার্ত্তিক , ১৩৮০ সংখ্যা ।)

অথবা —

'রস গেইছে রস গেইছে যবুনা গেইছে দুর।
এলাসে পিন্দিবার কইস মোক মনিরাজ ফুল ।'

(পৃ - ১৮ - ত্রিবৃত্ত লোক সংস্কৃতি সংখ্যা - ১৫ ই কাত্তিক, ১৩৮০)

এতে যখন কোন বস্তু প্রয়োজনেও জোটেনি, আজ যখন তা না হলেও চলে তখন তা জুটছে এই ব্যাপারটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । কোন ছিলকায় আবার সতীন কাঁটার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ।

যেমন —

'ইলিশ মাছের সাধু
ঝিলমিল কাঁটা
মইল্যাম মইল্যাম সাধু
দুই সতিনীর ঝাটা ।'

(পৃ - ১৯ - ত্রিবৃত্ত লোকসংস্কৃতি সংখ্যা - ১৫ ই কার্ত্তিক - ১৩০০)

আবার যখন রাজবংশি নারী বলে —

''কাঁচা গুয়া পাকা পান
ক্যানেবা খালেন
ডেকাইতে সমতি না দেন
গোসা ক্যানে হলেন ?''

(পৃ - ২০ - ত্রিবৃত্ত লোকসংস্কৃতি সংখ্যা - ১৫ ই কাত্তিক - ১৩০০)

তখন অভিমানী বা ক্ষুব্ধ প্রিয়তমের প্রতি তার কোমল মনের আর্ত্তি যেন ধরা পড়ে ।

বস্তুত এতদঞ্চলের মানুষের মনোবেদনা, সামাজিক সমস্যা, রহস্যালাপ সবকিছুর স্বরূপ উদ্ভাবনে এই ছিলকাগুলি এক অলিখিত দলিল বলা চলে ।

লোকদেবতা ঃ

কোচবিহারের গ্রাম জীবনে স্থানীয় দেবদেবীর প্রভাব এখনো সঞ্চিত রয়েছে । এই সব গ্রামীন লোক দেবতার একটা বড় অংশই এই অঞ্চলেরই নিজস্ব সৃষ্টি । সামান্য কয়েকটি লৌকিক দেবদেবীর নাম মাত্র পরিচয় এখানে তুলে ধরা হল ।

কোচবিহারে ওলাবিবি এখানকার হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আরাধ্য, আবার হিন্দুদের কামের দেবতা মদনকামের আরাধনায় 'হায় আল্লা'পদ আছে যা আপাত দৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ মনে হলেও অস্বাভাবিক নয়। আবার উত্তর ভারতের বহু দেবতার আরাধনাই এখানে হয় অপ্রচলিত, অথবা নিজস্ব রূপ গ্রহন করেছে । যেমন এখানকার রাজবংশী সমাজের 'গারাম পূজা' অমঙ্গল নাশ ও কৃষির উন্নয়ন কামনায় মূলতঃ লৌকিক শিবেরই পূজা । ক্ষেতের ফসল ও গোয়ালের গরুর মঙ্গল কামনায় গোরক্ষনাথের যে পূজা করা হয় তাও সম্পূর্ণ এখানকার নিজস্ব পূজা । এই পূজার মন্ত্রে তার প্রমান রয়েছে । যেমন —

' হাতে কঙ্কন পীরের মুখে চাপ দাড়ি
দই দুধ মাগিতে গেল নন্দগোপালের বাড়ি ।'

(পৃ - ২৮ - লোকায়ত দর্পনে উত্তরবঙ্গ - ডঃ দিগ্বিজয় দেসরকার ।)

তাছাড়া মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী অঞ্চলে পূজিতা ব্যাঘ্র বাহন ভান্ডানী দেবীর পূজাও সম্পূর্ণ এখানকার নিজস্ব পূজা । তাছাড়া অরণ্য ও প্রকৃতির রহস্যর প্রতি ভয়ও আরো দুই একটি পূজা অর্চনার জন্ম দিয়েছিল । যেমন মাষান ঠাকুর, বারুক ঠাকুর, জঙ্খা প্রেত ইত্যাদি পূজানুষ্ঠান । এখানকার পীরের দরগাগুলিতে হিন্দু মুসলমান সকলেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে । তবে গ্রাম শহরে ব্যাপক বিদ্যুতায়ন, শিক্ষার ক্রমপ্রসার, পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ক্রমশ প্রচলিত বাঙালী সামাজিক ও পারিবারিক উৎসবগুলি যেমন দূর্গাপূজা, লক্ষীপূজা,কালীপূজা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ইত্যাদি রাজবংশী সমাজের কাছে ও সমানভাবে গ্রহনীয় হয়েছে । কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি অধ্যায়ের এই আলোচনায় আমরা যে সমস্ত ব্যক্তিরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা মান্য সংস্কৃতির অঙ্গনে প্রবেশ করেননি কোচবিহারের-

সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক স্বরূপ উদঘাটনের স্বার্থে তাদের সংস্কৃতিক মননের স্বরূপটি সংক্ষেপে হলেও উদঘাটন করা হল। এই অঞ্চলের লোকসাহিত্য শিষ্টসাহিত্যকেও নানাভাবে প্রভাবিত করছে। নাটক, উপন্যাস, সংগীত, সাহিত্যের প্রভৃতি বিভাগ গুলিকেও সমৃদ্ধ করছে।

উৎস নির্দেশ

১) নন্দন, ডিসেম্বর, ১৯৯৩

২) উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া — হীতেন নাগ।